

রূপকথায় রূপ ও রূপান্তর

দেবতুষি মিশ্র চৌধুরী

সংক্ষিপ্তসার :

রূপকথায় আপাত রূপের অপরূপতার প্রতি আকর্ষণ, কদর্য্য রূপের প্রতি অবজ্ঞা, রূপান্তরের আড়ালে থাকে সামাজিক জটিল মনস্তত্ত্ব। জটিলতার গ্রন্থি বন্ধন নয়, রূপকথার উদ্দেশ্য নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জীবনকে সরল, সাবলীল করে তোলা, সদর্থক ভাবনার প্রসার ঘটিয়ে লোকসমাজকে উজ্জীবিত করা। রূপকথার রূপ জগতের নানা পট পরিবর্তনে সামাজিক পাঠ, নৈতিক পাঠ, মনস্তাত্ত্বিক পাঠ, লোকমানসের বিশ্বাস সংস্কার-এর বৈচিত্র্যময় প্রকাশ উদ্দিষ্ট আলোচনায় তুলে ধরার প্রয়াস করা গেল।

মূল শব্দ : সমাজ সমস্যা অতিক্রম, শক্তিগোপন, অভিশাপ, নৈতিকতা, আত্মার সঞ্চরণশীলতা, আত্মগোপন, ঈর্ষা, কালাজাদু, প্রতীক, রূপান্তর, আদর্শবোধ, মনস্তত্ত্ব, সদর্থক ভাবনা।

জীবনের সার্বিক পূর্ণতার কাঙ্ক্ষিত রূপ উঠে আসে রূপকথার গল্পে। রূপকথা অনেক সময়ই তাই হয়ে ওঠে বিশেষণ। খুব সুন্দর, নির্বাঞ্ছাট বা অসম্ভবকে সম্ভবের সীমায় আনার প্রসঙ্গে আসে রূপকথার তুলনা। রূপকথার কাহিনি, ঘটনা, চরিত্র সবই হয়ে ওঠে উপমা। রূপকথার জগৎ সাধারণ মানুষের কাছে ‘সব পেয়েছির দেশ’। তাই বুঝি বারেবারে ফিরে আসা রূপকথার কাছে। গানের কথায় উঠে আসে আত্ম সমর্পণের সেই ভাবনা—‘ও জীবন তোমার সাথে কাটাবো রূপকথাতে’। একবিংশ শতকীয় Destination wedding-এর যুগে নববধূর ডিজনিয়ালন্ডের রাজকন্যা হয়ে ওঠার স্বপ্নকে ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে বাস্তব করে তোলা হয়। ভিডিওটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তার সাথে ভাইরাল হয় এবং প্রচুর প্রশংসিত হয়। আসলে রূপকথা যেন মানবজীবনের সার্বিক চর্যার এক আদর্শ রূপায়ন। রূপকথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—“রূপকথা নামটির চারিধারে একটি রহস্যঘন মাধুর্য, একটি ঐন্দ্রজালিক মায়াঘোর বেস্তন ক্রিয়া আছে। নামটি আমাদের হৃদয়ের গোপন কক্ষে গিয়া আঘাত করে ও সেখানকার সুপ্ত নামহীন বাসনাগুলির মধ্যে একটা সাড়া জাগাইয়া দেয়।” (রূপকথা, বাংলা সাহিত্যের কথা) রূপকথার সৌন্দর্যচেতনা এগুলির জনমনরঞ্জনী ক্ষমতার মূল। কল্পনার পানসিতে অবাধে বিচরণের সুযোগ রয়েছে এ ধরনের গল্পে।

রূপকথার রাজা, রাণী, রাজপুত্র, রাজকন্যার রূপ অতুলনীয়। ‘ঠাকুরমা’র বুলি’র ‘কলাবতী রাজকন্যা’ গল্পে মেলে ‘কুঁচ-বরণ কন্যা মেঘ-বরণ চুল’ অর্থাৎ, কলাবতী রাজকন্যা কাঞ্চন বর্ণা, তার মেঘের মত এক ঢাল কালো চুল। ‘ঘুমন্ত পুরী’ গল্পেও মেলে ‘পরমা সুন্দরী রাজকন্যা’র কথা। কেবল আলোকসামান্য রূপের ঔজ্জ্বল্য নয়, রূপকথার মানবিকতায় উজ্জ্বল নৈতিক প্রেক্ষিত গল্পের আকর্ষণীয়তা ও সদর্থক ভাবনা বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

জার্মানি থেকে গ্রিমভাইদের সংগৃহীত ‘তিন সুতোকাটুনে’ গল্পে উঠে এসেছে এক অলস মেয়ের কথা, যে মায়ের শত বকুনি সত্ত্বেও সুতো কাটতে চায় না। শেষে একদিন যখন মা তাঁর এই অলস মেয়েটিকে তার আলসেমির জন্য

মারছেন, মেয়েটি জোরে জোরে কাঁদছে, তখনি সেই রাজ্যের রাণী যাচ্ছিলেন তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে, কান্নাকাটি শুনে তিনি তাদের বাড়িতে আসেন এবং এত কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। মেয়েটির মা রাণীর কাছে মেয়ের অপদার্থতা ঢাকতে বলে—তার মেয়ে সারা দিন ধরে সুতো কাটতে চায়, কিন্তু তাদের মত দরিদ্রের ঘরে সুতো কাটার এত সরঞ্জাম নেই। তাই তাঁর মেয়ে কাঁদছে। রাণী তাঁকে আশ্বস্ত করতে, মেয়েটিকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে চান, বলেন যে রাজপ্রাসাদে অনেক তন্তু আছে সে যত খুশি সুতো কাটতে পারবে সেখানে। মেয়ের মা রাণীর কথায় সানন্দে রাজি হয়ে যান। রাণী প্রাসাদে এসে মেয়েটিকে তিনটি ঘর দেখান, যেগুলি মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত তন্তুতে ভর্তি। রাণী বলে সুতো কাটা শেষ হলেই নিজের বড় ছেলের সাথে তার বিয়ে দেবে। ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন তো দূরের কথা, অলস মেয়েটি বোঝে সারাজীবন সুতো কেটে চললেও, এ কাজে সফল হবে না সে। ফলে চোখের জলে ভাসে সে। তার সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসে অদ্ভুতদর্শন তিন বুড়ি—একজনের চওড়া চ্যাপ্টা পা, একজনের চিবুক পর্যন্ত ঝুলে পড়া ঠোঁট, আর একজনের একটি হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি বিশাল বড়। মেয়েটি খুব খুশি হয়, অন্যদিকে তিন বুড়ি শর্ত রাখে যে বিয়ের সময় মেয়েটি যেন তাদের নিজের মাসি পরিচয় দিয়ে নিমন্ত্রণ করে, মেয়েটি রাজি হয়ে যায়। নিমেষে সব সুতো কাটা হয়ে যায়, রাণীও নিজের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সুতো কাটা শেষ হতেই নিজের বড় ছেলের সাথে মেয়েটির বিয়ের আয়োজন করেন। মেয়েটিও নিজের দেওয়া কথা রাখে। বিয়েতে মাসি পরিচয়ে তিন বুড়িকে সাদরে আপ্যায়ন করে নিজের পাশে বসায়। রাজপুত্র বুড়িদের সঙ্গে আলাপের ফাঁকে তাদের এমন দেহ বিকৃতির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। প্রথমজন জানায়—সুতো কাটার কাজে পাকে ক্রমাগত ব্যবহার করতে করতে তার পা এমন চওড়া চ্যাপ্টা হয়েছে। দ্বিতীয় জন বলে জিভ দিয়ে ক্রমাগত সুতো ভিজিয়ে ভিজিয়ে তার ঠোঁট গেছে ঝুলে আর তৃতীয় জন জানায় আঙ্গুল দিয়ে দিনের পর দিন সুতো পাকিয়ে তার বুড়ো আঙুলটি এমন আকার নিয়েছে। রাজপুত্র ভয় পেয়ে যায়। ঘোষণা করে তার সুন্দরী বৌ-এর এমন পরিণতি সে চায় না, তাই তার বৌ আর কখনও সুতো কাটবে না, মেয়েটিও এভাবে এক চরম সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পায়।

এভাবেই রূপকথায় আশাপূরণের দিশা সূচিত হয় সততার পথে চলে। সন্তানের ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তিত এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের জননী তার অলস মেয়ের আগামীকে সুরক্ষিত করতে তাকে অলসতা ভুলে পরিশ্রমী করে তুলতে চেয়েছে। ফলে তাকে তাঁত বুনতে জোর করেছে বা মেয়ের অলসতায় তার গায় হাত তুলেছে। তার চাহিদা পরিপূর্ণ হয়েছে—রাণী তার মেয়েকে নিজের সাথে প্রাসাদে নিয়ে যাবে বললে।

রাণীর ছিল তিন ঘর ভর্তি তন্তু, তিনি চাইছিলেন এমন কাউকে যে সেগুলি দিয়ে সুতো কেটে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারে। মেয়েটির মা নিজে শাসন করলেও অন্যের কাছে নিজের মেয়েকে ছোট করতে চাননি, ফলে বলেছিলেন, তার মেয়ে খুব সুতো ভালোবাসে, দারিদ্র্যের কারণে তারা সুতো কাটার উপাদান যোগান দিতে পারছেন না বলে মেয়ে কাঁদছে। আর রাণী এ কথা শুনে, পেয়ে যান তার সমস্যার সমাধান। ফলে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে যান। যদিও মেয়েটি না কাটলেও তিন বুড়ির সাহায্যে রাণীর আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হয়।

অন্যদিকে মেয়েটি—সে অলস, সে সুতো কাটতে চায় না, কিন্তু ভালো থাকতে চায়। রাণীর সাথে প্রাসাদে তো এলো কিন্তু প্রাসাদে এসে তার মাথায় হাত এবার কি হবে? তিনঘর ভর্তি তন্তু দিয়ে সারাজীবন সুতো কেটে গেলেও সে শেষ করতে পারবে না, ফলে রাণীর পুত্রবধূ হওয়া তো দূর সে তার ভবিষ্যৎ বিষয়ে আতঙ্কিত হয়। আর রূপকথার গল্পে এমন চরমতম অসম্ভবের মুহূর্তে আবির্ভাব ঘটে উপকারী চরিত্রের। বাংলা রূপকথায় ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, শুক-সারীর

মত এই জার্মান রূপকথায় এসেছে অদ্ভুত দর্শন তিন বুড়ি। তারা মেয়েটির সব সুতো কেটে দিয়েছে। ফল মেয়েটির আকাঙ্ক্ষাও পরিপূর্ণ হয়েছে। তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, রাজপুত্রের সাথে তার বিবাহ হয়েছে।

রূপকথার গল্প মানুষের নৈতিকতার পাঠকে মনের অন্তঃস্থল থেকে তৈরী করে, তাই দেখা যায় গল্পে তিন বুড়ি মেয়েটির হয়ে সব কাজ করে দিলেও, শর্ত রাখে তার বিয়েতে তাদের কুরূপকে ঘৃণা না করে, নিজের মাসি পরিচয় দিয়ে যান নিমন্ত্রণ করা হয়। আসলে অবস্থার উন্নয়নে, রাজপুত্রের সাথে বিবাহের পর অহংকার বশতঃ বা নিজের কাজ গোছানো হয়ে গেছে এমন মানসিকতায় সর্বোপরি তাদের কুশ্রী রূপের কারণে যেন তাদের অবজ্ঞা না করা হয়—উপকারীর উপকার স্বীকার করে কৃতজ্ঞ থাকার পাঠ যেমন উঠে এসেছে কাহিনীর এ অংশে, পাশাপাশি কুরূপকে অবজ্ঞা না করার পাঠও মেলে এ গল্পে। ফলে মেয়েটি তার সত্তার কারণেই অর্জন করেছে তার আর একটি চাহিদা পূরণের উপায়। রাজপুত্র তিন বুড়ির সাথে কথোপকথন কালে সুতো কাটার কারণেই তাদের এমন চেহারা হয়েছে জেনে, নিজের বৌকে আর কখনও সুতো কাটতে দেবে না জানায়, আর এভাবেই পরিপূর্ণ হয় মেয়েটির সব মনোবাঞ্ছা।

রূপকথার গল্পের আর একটি অত্যন্ত চেনা পরিসর, ছদ্মবেশ বা অন্য রূপে থাকা। রাশিয়ান রূপকথায় রাজকুমারী বাবার থেকে বেশি জাদুজ্ঞান নিয়ে জন্মানোয় তাকে তার বাবা তিন বছরের জন্য ব্যাণ্ড করে দেন। ছোটো রাজপুত্র ইভানের সঙ্গে ঘটনাচক্রে বিবাহ হয় সেই ব্যাণ্ড রাজকুমারীর। ব্যাণ্ডের চামড়া খুলতে সবাই দেখে দেখে তার অপরূপ রূপ— “সে কী রূপ, জানার নয়, বোঝার নয়, রূপকথাতেই পরিচয়।”^১ রাজপুত্র এ তথ্য জানামাত্র ব্যাণ্ডের চামড়া দেয় পুড়িয়ে। পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। ওই খোলস ছিল তার বিপদ অতিক্রমের আশ্রয়।

চীনের ডাই উপজাতির মানুষের মধ্যে প্রচলিত ময়ূর কুমারী গল্পে মেংবানজিয়ার রাজপুত্র যাওশুথুন মেংওভোংবান-এর রাজা যাওডিগাসালির ছয় কন্যা লাংসিনা হ্রদে সাঁতার কাটতে আসলে কনিষ্ঠা নানামারৌনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার ময়ূর পোশাকটি লুকিয়ে ফেললে, সে আর ময়ূরের রূপ নিতে পারে না, তার বোনেদের সঙ্গে ফিরেও যেতে পারে না। দুজনেই দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পিতা মাতার সম্মতিতে তাদের বিবাহ হয়, শত্রুদের কৌশলে তাদের জীবনে নেমে আসে দুর্যোগ। নানামারৌনা ময়ূর পোশাকটি রাণীর কাছ থেকে নিয়ে নৃত্যরত হয়, ধীরে ধীরে আবার সে এক ময়ূরীতে রূপান্তরিত হয় এবং শূন্যে উড়ে যায়। ফিরে যায় তার বাবার রাজ্যে। আর এভাবেই এই বেশ তার আত্মরক্ষার সহায়ক হয়। জীবনের নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আবার তাদের মিলন হয়। আর আজও ডাই উপজাতির মধ্যে ময়ূর নাচ শান্তি ও সুখের প্রতীক হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

যুয়াং উপজাতির একটি গল্পে দরিদ্র দম্পতির সন্তান হিসেবে জন্ম নেয় কুৎসিত, কদাকার এক ব্যাণ্ড। সন্তানকে কেন্দ্র করে সমাজ সমালোচনার ভয়ে ভীত ছিল তারা। কিন্তু তারা ক্রমশ বোঝে এ সাধারণ কোনও ব্যাণ্ড নয়। এ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। শুধু তাই নয় সাহস, বুদ্ধির জেরে এ সব সমস্যা দূর করতেও সমর্থ। তাদের রাজ্য শত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত হলে নিজের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কৌশলী বুদ্ধির মাধ্যমে ব্যাণ্ড সব সমস্যার সমাধান করে এবং রাজাকে বলে কথা মত তিনি যেন তার কন্যার সাথে তার বিয়ে দেন। রাজা তার অনিচ্ছা প্রকাশ না করতে পারলেও, কৌশলের আশ্রয় নেন। বলেন—রাজকন্যার সূচীকর্মখচিত বল রাজকন্যা নিষ্কপ করবেন। যে ধরতে পারবে, তার সাথেই বিয়ে হবে তার। বল ছোড়া হল। ব্যাণ্ড একটি তীব্র নিঃশ্বাস টানল এবং ঘূর্ণায়মান টর্নেডোর মত বলটিকে সরাসরি তার নিকট টেনে নিল। রাজা রোষভরে ঘোষণা করেন—‘রাজকুমারী কর্তৃক নিষ্কিপ্ত সূচীকর্মখচিত বল শুধুমাত্র মানুষই হাত দিয়ে ধরতে পারবে, অন্য কোন প্রাণী নয়।’^২ দ্বিতীয়বার আবার বল ছোড়া হল। এক সুদর্শন, দীর্ঘাঙ্গী তরুণ বলটি ধরে ফেলে। সেই তরুণ আর কেউ নয়, সেই ব্যাণ্ড। রাজকুমারীর সাথে বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত সে তার রূপ পাল্টায়নি।

দিনের বেলা ব্যাঙের রূপে থাকে আর রাতে তার সবুজ চামড়া ঝেড়ে হয়ে যায় দীর্ঘকায়, সুদর্শন যুবক। রাজকন্যার কাছে ব্যাঙের এই গোপন কথা জেনে রাজা তাকে এই বীভৎস ব্যাঙের চামড়া পরে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ব্যাঙ জানায় এটি অমূল্য। এটি তার বর্ম। যা শীতকালে গরম, গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা রাখে, বাতাস-বৃষ্টি, আগুন থেকে বাঁচায়। ব্যাঙ আরও বলে—‘যতদিন আমি এটা পরব, আমি হাজার হাজার বাঁচার বাঁচতে সক্ষম হব।’^৩ এই শুনে রাজা সেই চামড়াটি পরতে চায়, ব্যাঙ তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যায়। কিন্তু, রাজা পরার পর আর সেটি খুলতে পারে না। তিনি চিরতরে ব্যাঙ হয়ে যান। আর ব্যাঙ রাজার পোষাক পরে রাজা হয়ে, সুখে রাজত্ব করতে থাকে।

বাংলার রূপকথার গল্প কলাবতী রাজকন্যা গল্পেও আমরা পাই বুদ্ধ, ভূতুমকে। বানররূপী ছোটরানীর পুত্র বুদ্ধ আর পেঁচারূপী ন-রানীর পুত্র ভূতুম। বড় রানীদের চক্রান্তে মানুষের গর্ভে বান্দর, পেঁচা রূপে জন্ম নিলেও তারা ছিল অনন্য ক্ষমতাসম্পন্ন। গল্পের শেষে দেখা যায় এই বানর ও পেঁচা রূপেই তারা অসাধ্য সাধন করেছে, বহু প্রতিকূলতা জয় করে লাভ করেছে কলাবতী ও হীরাবতী রাজকন্যাকে। সার্বিক আনন্দের পরিবেশ তৈরী হয়েছে রাজ্যজুড়ে, তাদের দুই অভাগিনী মায়ের সাথে তাদের পিতা—রাজ্যের রাজার মিলন হয়েছে। শাস্তি পেয়েছে তাদের দুষ্কৃতকর্মকারী সৎ মা ও সৎ ভাইয়েরা; আর তখনই একদিন ‘খুব রাতে হীরাবতী কলাবতী উঠিয়া দেখেন, —একি! হীরাবতীর ঘরে তো সোয়ামী নাই! কলাবতীর ঘরেও তো সোয়ামী নাই! —কি হইল, কি হইল? দেখেন—বিছানার উপরে এক বানরের ছাল, বিছানার উপরে এক পেঁচার পাখ!!’

দুই রাজকন্যা বোঝেন এঁরা সত্যিকারের বানর, পেঁচা না, আর উঁকি দিয়ে দেখেন দেবতার মত দুই রাজপুত্র ঘোড়ায় চেপে সারারাত রাজপুরী পাহারা দিয়ে বেড়ান। দুই বোন যুক্তি করে “পেঁচার পাখ বানরের ছাল প্রদীপের আগুনে” পুড়িয়ে ফেলেন। রাজপুত্ররা জানতে পেরে বলেন—

“এ কি করিলে! —সন্ধ্যাসীর মন্ত্র ছিল, ছদ্মবেশে থাকিতাম, দেবপুরে যাইতাম আসিতাম।... আর তো সে সব করিতে পারিব না!’ অর্থাৎ, ওই ছদ্মবেশ ছিল তাদের অলৌকিক শক্তির উৎস, দেবপুরের সাথে সান্নিধ্যের মাধ্যম। কিন্তু ততদিনে বিপদ গেছে কেটে, অপরাধী শাস্তি পেয়েছে, ফলে নবরূপে দুধকুমার এবং রূপকুমার সবাইকে নিয়ে সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে লাগলেন। অর্থাৎ প্রতি ক্ষেত্রেই ছদ্মবেশ উদ্দিষ্টকে কিছুটা অতিরিক্ত শক্তি দেয়, যে শক্তি অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত। শুধু তাই নয় ছদ্মবেশ উদ্দিষ্টকে নানা বিপদ অতিক্রমের উপায়, পথ নির্দেশ করে; তার প্রকৃত ক্ষমতা সম্পর্কে প্রতিপক্ষকে অজ্ঞাত রাখে। এই ছদ্মবেশ উদ্দিষ্টকে আত্মবিশ্বাসীও করে, ফলে এর জোরেই সে অনেক প্রতিকূলতা জয় করতে পারে।

জার্মান রূপকথা ‘ব্যাঙ রাজকুমার’ গল্পে ছদ্মবেশ আত্মশুদ্ধিকরণ ঘটায়। বাহ্যিক রূপের থেকে অন্তরাত্মার সৌন্দর্য্যায়ন যে অধিক কাঙ্ক্ষিত তা উঠে আসে এই রূপকথায়। এ যেন বৌদ্ধ ‘কুশজাতকের কাহিনী’। মলরাজ্যের রাজা ইক্ষাকুর প্রধান মহিষী শীলবতীর ইন্দ্রের বরে দুই পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশকুমার বলশালী, গুণী, বুদ্ধিমান, সর্ববিদ্যায় পারদর্শী কিন্তু অত্যন্ত কুৎসিত দর্শন। কাহিনীর শেষে সব সমস্যা অতিক্রমের পর অনিন্দ্যসুন্দরী প্রভাবতীর সঙ্গে তার মিলন ঘটে এবং ইন্দ্রের বরে রূপবান হয়ে ওঠেন। মহাবস্তু অবদানেও কুৎসিত কুশরাজা সব সমস্যা দূর করার পর সুদর্শনার সান্নিধ্য পান ও ইন্দ্রের বরে রূপবান হয়ে ওঠেন তিনি। আসলে বাহ্যিক রূপের তুলনায় অস্ত্রের সৌন্দর্য্যের কথা বারবার এসেছে পুরান কাহিনীতে লোককথায়— রূপকথায়।

কেবল ছদ্মবেশ নয় রূপকথার গল্পে রূপ বদলে বড় ভূমিকা নেয় সর্ব-আত্মবাদ। মনস্তাত্ত্বিক এই বিষয়টি নানা ভাবে উঠে এসেছে রূপকথার গল্পে। সর্ব-আত্মবাদ - অর্থাৎ—“The belief in souls; the attribution of spirit

or personality to physical objects or phenomena.” (Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore Mythology And Legend, 1st Part, 1949, P-62) অর্থাৎ, আত্মায় বিশ্বাস, প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আশ্চর্যজনক বিষয়ে আত্মা বা সত্তার আরোপই হল সর্ব-আত্মবাদ। ই. বি. টাইলার আত্মার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন—

১. আত্মা অপ্রতীয়মান, অদৃশ্য, অবিনশ্বর, অদাহ্য।
২. এক কায়হীন ছায়া এবং বাষ্পের মত।
৩. ব্যক্তি বিশেষের জীবন ও চিন্তার জন্য দায়ী।
৪. আত্মার নিজস্ব চেতনা ও ইচ্ছা থাকে।
৫. যে ব্যক্তির শরীরে আত্মা থাকে তার অতীত ও বর্তমানের আশা-আকাঙ্ক্ষার মত আত্মার চেতনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বর্তমান।

৬. সাধারণতঃ স্পর্শের অতীত ও অদৃশ্য অবস্থায় আত্মা তড়িৎ গতিতে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতে পারে।
৭. যে কোন অবস্থায় একপ্রাণী দেহ থেকে অন্য প্রাণীর দেহে আত্মা প্রবেশ করতে পারে।
৮. মানুষের জাগ্রত বা ঘুমন্ত অবস্থায় আত্মা নির্গত ও প্রবিষ্ট হতে পারে।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ‘ঠাকুরমা’র ‘বুলি’র ‘সাত ভাই চম্পা’ গল্পে দেমাকি, অমানবিক, ঈর্ষাপরবশ বড় রাণীরা ছোটোরানী ও রাজার চোখে ধুলো দিয়ে ছোটরাণীর নবজাত সাত ছেলে ও এক মেয়েকে আঁতুড় ঘর থেকে নিয়ে গিয়ে একে একে পুঁতে ফেলে পাঁশগাদায়। “পাঁশগাদার উপরে সাত চাঁপা এক পারুল গাছে, টুলটুলে সাত চাঁপা এক পারুল”^৮ ফুটে থাকতে দেখে মালি। মালি ফুল পাড়তে গেলে ফুলগুলি বলে ওঠে—

“না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতক দূর,
আগে আসুক রাজা, তবে দিব ফুল!”^৯

রাজা এলে তারা একে একে বড়ো রাণী, সেজ রাণী, ন রাণী, কনে রাণী, দুয়োরানী সকলকে ডাকে। কিন্তু কেউই ফুল পায় না। ফুলের গিয়ে আকাশে তারার মতো ফুটে থাকে। শেষে তারা বলে—

“যদি আসে রাজার ঘুঁটে কুড়ানো দাসী,
তবে দিব ফুল।”^{১০}

সন্তানহারা ছোটরাণীকে বড় রাণীরা ঘুঁটে কুড়ানী দাসীতে পরিণত করেছিল। শেষে ছোটরাণী আসাতে “সুরসুর করিয়া চাঁপারা আকাশ হইতে নামিয়ে আসিল, পারুল ফুলটি গিয়া তাদের সঙ্গে মিশিল; ফুলের মধ্যে হিতে সুন্দর চাঁদের মত সাত রাজপুত্র আর এক রাজকন্যা ‘মা মা’ বলিয়া ডাকিয়া, বুপ বুপ করিয়া ঘুঁটে কুড়ানী দাসী ছোটরাণীর কোলে-কাঁখে ঝাঁপাইয়া পড়িল।”^{১১} তারাই ছোটরাণীর সাত পুত্র আর এক কন্যা। আত্মার সঞ্চারমানতার তথ্য উঠে এসেছে এখানে। মানব দেহ থেকে ফুলে আবার ফুল থেকে মানব দেহে এসেছে আত্মা।

কাশ্মীরি এক রূপকথা ‘তোতার কথা’-তে দেখা যায় ইরানের এক রাজা বাহাদুর খান তাঁর রাণীদের জন্য তাঁর রাজ্যে একটি বাগান বানান যেখানে কোনও পুরুষ বা অপরিচিতের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। হঠাৎ সেখানে এক ফকিরের আগমন ঘটে। দূত মারফত সে খবর পৌঁছায় রাজার কাছে। রাজা তার মন্ত্রীকে নিয়ে সেখানে আসেন এবং লোকটিকে

জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করেন। ফকির বলেন আমি হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই এখানে এসে পড়েছি, কিন্তু আমি তো আপনার কোনো ক্ষতি করিনি। রাজা রাগান্বিত হয়ে ফকিরকে কিছু বলতে যেতেই দেখেন ফকিরের দেহ প্রাণহীন হয়ে মাটিতে পরে রয়েছে, আর নিকটবর্তী একটি পুষ্পিত বৃক্ষের তলায় পড়ে থাকা প্রাণহীন এক বুলবুলি পুনরায় প্রাণ পেয়ে ডানা মেলে বাগান থেকে উড়ে যায়, কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ফিরে আসে। তারপর আবার সেটি প্রাণহীন হয়ে ভূ-পতিত হয় আর ফকিরের মৃত-দেহ জীবন্ত হয়ে ওঠে। আসলে ফকির তাঁর এই জাদুক্ষমতা রাজার সামনে প্রদর্শন করেন। তারপর তিনি সেখান থেকে বিদায় নিতে চান। কিন্তু রাজা তাঁর কাছ থেকে এই অসাধারণ জাদু ক্ষমতাটি শিখতে চান। ফকির তার গোপন জাদু কৌশল রাজাকে বিশ্বাস করে শিখিয়ে দেন, আর রাজাও মন্ত্রীকে বিশ্বাস করে তা শিখিয়ে দেন মন্ত্রীকে। তাঁদের মধ্যেই গোপন থাকে এ কথা।

একদিন রাজা ও মন্ত্রী একত্রে গেছেন শিকারে। বনমধ্যে তাঁরা একটি মৃত টিয়া দেখতে পান। রাজা তাঁর মন্ত্রীকে ডেকে বলেন— ‘ওহে মন্ত্রী, যখন এই টিয়া পাখিটি জীবিত ছিল, তখন কত সুন্দরই না ছিল এ। তুমি তোমার আত্মাকে কিছুক্ষণের জন্য এর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করো, আমি পাখিটিকে কিছুক্ষণের জন্য জীবন্ত দেখতে চাই।’

মন্ত্রী বলেন— ‘মহারাজ, এ অনেকক্ষণ আগে মারা গেছে, এর মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধ আসছে, কে জানে এ কখন মারা গেছে! আমি পারবো না, মহারাজ, আমি কী করবো?’

রাজা বললেন— ‘আমি দেখতে পাচ্ছি কত সুন্দর এই টিয়া!’ কিন্তু মন্ত্রী তাতেও অসম্মত হলেন, আসলে তাঁর মনের এক অন্যগোপন ইচ্ছা ছিল। শেষে রাজা তাঁর মনের ইচ্ছাকে সফল করতে নিজেই নিজের শরীর ছেড়ে তাঁর আত্মাকে টিয়ার শরীরে প্রতিস্থাপন করেন। টিয়া জীবন্ত হয়ে ওঠে, ওড়াউড়ি করতে শুরু করে। মন্ত্রী ঠিক এই সময়েরই অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি তার নিজের আত্মাকে রাজার শরীরে প্রবিষ্ট করেন। রাজার শরীরে প্রবঞ্চক মন্ত্রী। সে রাজার ঘোড়ায় আরোহন করে, এবং দুটি মারফৎ সৈন্যদের কাছে খবর পাঠায় নিজের ঘোড়া থেকে পড়ে মন্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

শুধু তাই নয় সেই অসাধু মন্ত্রী রাজার শরীরে অনুপ্রবেশ করে, ধারালো তরোয়াল সহযোগে নিজের মৃত-দেহটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেন। নিজের সব সমস্যা সমাধানের জন্য সৈন্যদের তিনি বলেন— ‘যে একটি টিয়া মারতে পারবে, আমি তাকে পুরস্কৃত করবো।’

টিয়ার শরীরে রাজা তা শুনতে পান। নিজের প্রাণ বাঁচাতে তিনি বহুদূরে সেই অসীম ক্ষমতাস্বামী ফকিরের কাছে উড়ে যান এবং তার প্রাণরক্ষার আর্জি জানান। ফকিরের আশ্রয়ে থাকায় কেউ টিয়াটিকে মারতে পারে না।

একদিন সেই মন্ত্রী-রাজা বনে যায় শিকার করতে এবং একটি হরিণীর পশ্চাদ্ধাবন করেন। তিনি তাঁর সৈন্যদের বলেন— ‘এটিকে ধরতেই হবে, যে একে পালতে দেবে আমি তার মাথা নেবো।’

কিন্তু হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া আসে আর হরিণীটা মন্ত্রী-রাজার মাথার উপর দিয়ে লাফিয়ে পালায়। সদলবলে তারা তার পিছু নেয়।

টিয়া-রাজা ছিল সেই ফকিরের সাথে, যে ফকির অসামান্য এক জাদুকর, যিনি স্বয়ং এই বিশেষ জাদুশক্তির প্রকৃত অধিকারী। ফকির টিয়া-রাজাকে বলেন— ‘রাজন, আজই আপনি আপনার দেহ ফায়ার পাবেন।’

ইতিমধ্যে হরিণীটি তার অনুসরণকারীদের দৃষ্টিপথের আড়ালে বহুদূর চলে গেছে। মন্ত্রীর আত্মা রাজার শরীর ছেড়ে হরিণীকে ধরতে জঙ্গলে পড়ে থাকা একটি মৃত ভাল্লুকের দেহে প্রবিষ্ট হন।

টিয়া-রাজার কাছে আগে থেকেই খবর ছিল যে অসাধু মন্ত্রী সেখানে আসছে, ফলে তিনি মন্ত্রীই-রাজার গতিবিধি

খেয়াল রাখছিলেন। একটি গাছের গর্ত থেকে যেই তিনি দেখেন, মন্ত্রী তাঁর (রাজার) দেহ ছেড়ে ভল্লুকের দেহে ঢুকেছে, তিনি পুনরায় নিজের দেহে প্রবেশ করেন।

ফলে টিয়ার মৃতদেহটি ভূ-পতিত হয়, রাজা নিজদেহে আর মন্ত্রী ভল্লুকের দেহে। রাজা নিজ ঘোড়ায় আরোহণ করেন এবং নিজের সৈন্যদের বলেন ভল্লুকটিকে মারতে। সৈন্যরা ভালুকটিকে গুলি করলো ও তার পা ভেঙে দিলো। তারপর তাকে ধরে নিয়ে এল রাজার কাছে। রাজা বললেন— ‘তুমি আমার সাথে প্রবঞ্চনা করেছো, তোমায় মেরে ফেলা ছাড়া আমি আর কি করতে পারি? নিলে আবার লোকে আমার সম্পর্কে বলবে যে-রাজার একটি ভালুক আছে, যে নাকি তাঁর মন্ত্রী। তুমি তো তোমার দেহটিও নষ্ট করে দিয়েছো। এখন আমি আর বেশিক্ষণ এই ভালুকরূপী মন্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো না। তাই আমি তোমাকে মারতে চলেছি।’

এরপর রাজার সৈন্যরা কাঠ স্তুপীকৃত করে ভালুক-মন্ত্রীর দেহকে সেখানেই ভস্মে পরিণত করে।

রাজা বাহাদুর শাহ সুখে শান্তিতে রাজ্য-শাসন করতে থাকেন।

1896 খ্রিস্টাব্দে Harmukh Peak Mohand Marg-এর Panzin (Panzil) গ্রামের Hatim Tilwani-র কাছ থেকে Mark Aurel Stein কর্তৃক সংগৃহীত এ গল্প নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ-এর পাশাপাশি বিশ্বাস-সংস্কার কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির একটি বিশাল পরিসর বহন করে আছে। জাদু-বিশ্বাস, আত্মার সঞ্চারমানতা, মুহূর্তে আত্মার দেহবদল ক্ষমতা উঠে এসেছে এ গল্পে। পরিশেষে অসৎ-এর পরাজয়, সৎ-এর জয় সুনিশ্চিত ভাবে ঘোষিত হয়েছে।

লোককথার আত্মার এই পরিভ্রমণ তত্ত্ব ও রূপবদল Mr. E. J. W. Gibb অনুবাদিত The History of the Forty Vazirs-এর গল্পেও মেলে। যেখানে রাজা আত্মার দেহবদলের কৌশল শেখে এক দরবেশের কাছে এবং রাজা তার উজিরকে পাশেই কৌশল সম্পর্কে অবগত করেন, যিনি প্রথম তাঁর উপরেই তা প্রয়োগ করেন। রাজার আত্মাকে জোর করে একটি মৃত টিয়ায় প্রবেশে বাধ্য করা হয়, যেটি বাগানের মালি এক গণিকাকে বিক্রি করে দেয়। গণিকা বহুমূল্যে টিয়াটি এক বণিককে বিক্রি করে দেয়। যদিও এটি গণিকার স্বপ্ন ছিল। গণিকা পাখিটি বেচতে চায়। নানা জনের সাথে দর কষাকষির শেষে পাখিটি কেনেন রাজার প্রধান মহিষী। ইতিমধ্যে রাজার শরীরে থাকা উজির প্রধান মহিষীর ঘনষ্ঠ হবার জন্য তাকে এই গোপন কৌশল শিখিয়ে দেন। মহিষী রাজার শরীরে থাকা উজিরকে বাধ্য করেন নিজের শরীর ছেড়ে অন্যত্র যেতে আর টিয়ার শরীরে থাকা রাজা এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষা করছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের রাজদেহে প্রবেশ করেন এবং উজিরকে হত্যা করেন। Sir G. Grierson পঞ্চতন্ত্রের বিক্রমাদিত্যের গল্পের সঙ্গে এর তুলনা করেছেন। দেহ এবং আত্মার পৃথক অস্তিত্ব, আত্মার পরিভ্রমণ তত্ত্ব, ভিন্ন রূপধারণ এভাবেই নানা কাহিনীকে কেন্দ্র করে লোকমনের অভিক্ষেপ প্রকাশ করেছে।

রূপকথার গল্পের রূপ পরিবর্তনের আর একটি পরিসর ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কৃষ্ণ জাদু। ‘ঠাকুরমা’র বুলি’র ‘শীত বসন্ত’ গল্পে ঈর্ষায় জর্জর সুয়োরাগী দুয়োরাগীর মাথায় ক্ষার খেল দেওয়ার নামে তার মাথায় ‘ওষুধের বড়ি টিপিয়া দিল।’^{২২} আর দুয়োরাগী টিয়া পাখি হয়ে উড়ে যায়। কাহিনীর শেষে টিয়ার মাথা থেকে ওষুধ বড়ি খসে পড়তেই টিয়ার রূপ ছেড়ে দুয়োরাগী তার নিজের রূপে ফিরে আসে।

মানব মননের ভাব তরঙ্গের নানা উন্মেষ উঠে আসে রূপকথার গল্পে। রূপকথার রূপের পাথারে এভাবেই উঠে আসে অপরূপ। পার্থিব জগতের রূপ, কুরূপ কিংবা লোকমানসের বিশ্বাস-সংস্কারের সূত্রে রূপ-বৈচিত্র্যের নানা পরিসর অমোঘ আকর্ষণ বজায় রেখে, গল্পরসে জারিত হয়ে উঠে আসে রূপকথায়, কিন্তু এর মূল অভীষ্ট নৈতিক পাঠ, অন্তর্দর্শন। রূপকথার স্বাতন্ত্র্যের অপরূপতা এখানেই।

তথ্যসূত্র :

- ^১ ব্যাঙ রাজকুমারী, রুশ দেশের উপকথা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ-৯৮
- ^২ ব্যাঙ হল সশ্রুট, ময়ূর কুমারী—চীনের লোক-কাহিনীর নির্বাচিত সংকলন (তৃতীয় খন্ড), অনুবাদ : আব্বাস উদ্দীন আহমেদ, বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, বেইজিং, চীন, ১৯৮৩, পৃ-৭৬
- ^৩ ব্যাঙ হল সশ্রুট, ময়ূর কুমারী—চীনের লোক-কাহিনীর নির্বাচিত সংকলন (তৃতীয় খন্ড), অনুবাদ : আব্বাস উদ্দীন আহমেদ, বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, বেইজিং, চীন, ১৯৮৩, পৃ-৭৬
- ^৪ কলাবতী রাজকন্যা, ঠাকুরমা'র বুলি, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, মিত্র ও ঘোষ, ১৪২৪, পৃ-৫০
- ^৫ কলাবতী রাজকন্যা, ঠাকুরমা'র বুলি, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, মিত্র ও ঘোষ, ১৪২৪, পৃ-৫১
- ^৬ Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore Mythology And Legend, Maria Leach, 1st Part, Harper San Francisco, 1949, P-62
- ^৭ মিশ্র, দেবতুষি। ১ সেপ্টেম্বর, ২০১০। লোকসংস্কৃতির রূপ স্বরূপ। সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা।
- ^৮ সাত ভাই চম্পা, ঠাকুরমা'র বুলি, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, মিত্র ও ঘোষ, ১৪২৪, পৃ-৭১
- ^৯ ঐ
- ^{১০} ঐ, পৃ-৭৩
- ^{১১} ঐ, পৃ-৭৩
- ^{১২} শীত বসন্ত, ঐ, পৃ-৭৪

গ্রন্থস্বর্ণ :

- ^১ মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন। পৌষ ১৪২৪। দক্ষিণারঞ্জন সমগ্র। প্রথম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ।
- ^২ মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন। আষাঢ় ১৪২১। দক্ষিণারঞ্জন সমগ্র। দ্বিতীয় খন্ড, মিত্র ও ঘোষ।
- ^৩ মিশ্র চৌধুরী, ড. দেবতুষি। জুন ২০২০। বাস্তবের মাটি ছুঁয়ে অপরূপকথা ঠাকুরমা'র বুলি। প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা।
- ^৪ Stein, Aurel. 2005. *Hatim's Tales Kashmiri Stories and Songs*, Gulshan Books, Srinagar, Kashmir, 2005

লেখক পরিচিতি :

সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ,
সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন
ইমেল : debtusimisra@gmail.com